OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 77
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 693 - 700
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iii, Published on July issue 2026, Page No. 693 - 700
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

সন্দ্বীপের কৃষক বিদ্রোহ : পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক সংগ্রামের ইতিহাস

রঘুনাথ রায়
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
এস বি এস গর্ভমেন্ট কলেজ, হিলি
Email ID: raghunathroy1983@gmail.com

Received Date *15. 06. 2026*
Selection Date *15. 07. 2026*

Keyword
সন্দ্বীপ, জোতদার–জমিদার সম্পর্ক, ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা, ব্রিটিশ শাসন, কৃষক প্রতিরোধ।

Abstract

সন্দ্বীপের কৃষক বিদ্রোহ অবিভক্ত বাংলার, বিশেষত পূর্ববঙ্গের, অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক কৃষক আন্দোলন হিসেবে ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। মোট চারটি বিদ্রোহ সংঘটিত হয়— যার প্রথমটি মুঘল আমলে (১৬৩৭–১৬৬৫) এবং পরবর্তী তিনটি ব্রিটিশ শাসনামলে (১৭৬৯, ১৮১৯ ও ১৮৭০ সালে)। প্রতিটি বিদ্রোহ ভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে সংঘটিত হওয়ায় এর চরিত্র, লক্ষ্য ও প্রতিরোধ পদ্ধতিতেও বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত ভূমিরাজস্ব নীতি, জমিদারি শোষণ এবং ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে কৃষকদের প্রতিরোধচেতনা ক্রমশ বিকশিত হয়।

সন্দ্বীপের কৃষক বিদ্রোহ বিশ্লেষণে জোতদার–জমিদার সম্পর্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। বিদ্রোহের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব দিলাল, আবু তোরাপ, গোবিন্দচরণ চৌধুরী ও চাঁদ মিয়া ছিলেন স্থানীয় জোতদার শ্রেণির প্রতিনিধি, যারা কৃষকদের স্বার্থরক্ষায় ইংরেজপুষ্ট বহিরাগত জমিদার ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব প্রদান করেন। অন্যদিকে গোকুল ঘোষাল, প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস এবং অ্যাচিলা কোর্জনের মতো বহিরাগত জমিদার ও আহাদদাররা ভূমিরাজস্ব বৃদ্ধি, জরিপ কার্যক্রম এবং জোরপূর্বক খাজনা আদায়ের মাধ্যমে কৃষকদের ওপর শোষণ তীব্রতর করে তোলে। এর ফলে কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ ও প্রতিরোধের মনোভাব গড়ে ওঠে। বিশেষত ১৮৭০ সালের বিদ্রোহে মুন্সি চাঁদ মিয়ার নেতৃত্বে সংগঠিত অসহযোগ আন্দোলন কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধকে শক্তিশালী করে এবং ব্রিটিশপুষ্ট জমিদারি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক সফল গণ আন্দোলনের রূপ নেয়। সন্দ্বীপের কৃষক বিদ্রোহ তাই কেবল একটি আঞ্চলিক কৃষক-অভ্যুত্থান নয়; বরং এটি পূর্ববঙ্গের কৃষক সমাজের রাজনৈতিক চেতনা, সামাজিক সংগঠন এবং ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিল।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 77
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 693 - 700
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Discussion

ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে অসংখ্য ছোট-বড় কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হলেও সন্দ্বীপের কৃষক বিদ্রোহ ছিল প্রথমদিককার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক আন্দোলন। সন্দ্বীপে মোট চারটি বিদ্রোহ সংঘটিত হয়— যার প্রথমটি মুঘল আমলে (১৬৩৭–১৬৬৫) এবং পরবর্তী তিনটি ব্রিটিশ শাসনামলে (১৭৬৯, ১৮১৯ ও ১৮৭০ সালে)। তবে এসব বিদ্রোহের চরিত্র ও প্রকৃতি অভিন্ন ছিল না; কারণ প্রতিটি বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল ভিন্ন রাজনৈতিক শাসন ব্যবস্থা ও পৃথক ভূমিরাজস্ব নীতির প্রেক্ষাপটে। ফলে কৃষকদের অভিজ্ঞতা, প্রতিরোধের রূপ এবং আন্দোলনের কৌশলেও বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান আলোচনায় মূলত ব্রিটিশ আমলে সংঘটিত সন্দ্বীপের কৃষক বিদ্রোহসমূহকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যদিও সামগ্রিক প্রেক্ষাপট নির্মাণের জন্য মুঘল আমলের বিদ্রোহও সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। বিশেষত ১৭৬৯ সালের বিদ্রোহটি তুলনামূলক ভাবে অধিক আলোচিত, সুসংগঠিত এবং ঐতিহাসিক ভাবে অধিক তাৎপর্যপূর্ণ বলে বিবেচিত।

সন্দ্বীপের কৃষক বিদ্রোহ আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চা (micro-history)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হলেও বৃহত্তর কৃষক আন্দোলনের আলোচনায় এটি প্রায়শই উপেক্ষিত থেকে গেছে। এর ফলে এ বিষয়ে প্রাপ্ত সাহিত্য ও প্রামাণ্য উৎসও তুলনামূলকভাবে সীমিত। বিদ্রোহ সম্পর্কিত প্রধান আলোচনা পাওয়া যায় রাজকুমার চক্রবর্তী ও অনঙ্গমোহন দাস রচিত *সন্দ্বীপের ইতিহাস* গ্রন্থে, যেখানে স্থানীয় দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সন্দ্বীপের ইতিহাস বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া সুপ্রকাশ রায়ের 'ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম' গ্রন্থে শ্রেণিভিত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই বিদ্রোহকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মুতাসির মামুন সম্পাদিত 'বাংলাদেশের নিম্নবর্গ বিদ্রোহ ও সশস্ত্র প্রতিরোধ' গ্রন্থেও সন্দ্বীপের বিদ্রোহ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রয়েছে। তদুপরি, প্যারীমোহন সেনের 'নোয়াখালীর ইতিহাস', সতীশচন্দ্র মিত্রের 'যশোর খুলনার ইতিহাস', এবং রাখালচন্দ্র নাথ সম্পাদিত '১৮ ও ১৯ শতকের বাংলায় কৃষক অসন্তোষ ও বিদ্রোহের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে দীপঙ্কর বিশ্বাস রচিত "সন্দ্বীপের বিদ্রোহ : কৃষক বিদ্রোহের এক অনন্য নজির" শীর্ষক প্রবন্ধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পাশাপাশি সরকারি দলিল হিসেবে 'নোয়াখালী ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার'-এও এই বিদ্রোহ সম্পর্কিত বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংরক্ষিত রয়েছে।

এই আলোচনা সন্দ্বীপের কৃষক বিদ্রোহকে একটি স্বতন্ত্র আঞ্চলিক প্রতিরোধ আন্দোলন হিসেবে বিশ্লেষণ করে, যা বৃহত্তর ঔপনিবেশিক শোষণব্যবস্থার বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগঠিত ও সচেতন প্রতিরোধের এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

সন্দ্বীপের ইতিহাস ও প্রাচীনত্ব নির্ণয় ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে একটি জটিল বিষয়। তবে ইউরোপীয় পর্যটক ও গবেষকদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, এই অঞ্চলে প্রায় তিন হাজার বছরেরও অধিক সময় ধরে লোকবসতি বিদ্যমান ছিল। ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমেও সন্দ্বীপের প্রাচীনতার প্রমাণ পাওয়া যায়, যা ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিত ড. গ্রিয়ার্সনের পর্যবেক্ষণে প্রতিফলিত হয়েছে। এছাড়া বাখরগঞ্জের ইতিহাসকার ও পর্যটক সিজন ফেডারিক ১৫৬৫ সালে সন্দ্বীপ পরিদর্শন করে একে পৃথিবীর অন্যতম উর্বর দ্বীপ হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন।[১] ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে সন্দ্বীপ প্রাচীনকাল থেকেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক কার্যকলাপের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বণিকজাহাজ এখানে নোঙর করত এবং সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বাণিজ্যবান্ধব পরিবেশের কারণে দ্বীপটিতে বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড ও স্থায়ী বসতির বিস্তার ঘটে। ১৭৭৬ সালের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, প্রতিবছর সন্দ্বীপে উৎপাদিত প্রায় এক লক্ষ ত্রিশ হাজার মণ লবণ প্রায় তিনশত জাহাজে করে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠানো হত।[২]

সন্দ্বীপ শুধু লবণ উৎপাদনের জন্যই নয়, স্বল্প ব্যয়ে উন্নতমানের জাহাজ নির্মাণের জন্যও সুপ্রসিদ্ধ ছিল। এখানকার নির্মিত জাহাজ ইউরোপ পর্যন্ত রপ্তানি হত এবং তুরস্কের সুলতান পর্যন্ত সন্দ্বীপ থেকে জাহাজ ক্রয় করেছিলেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। এই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও কৌশলগত অবস্থানের কারণেই ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে পর্তুগিজরা এখানে উপনিবেশ স্থাপনে আগ্রহী হয়ে ওঠে। ফলে সন্দ্বীপ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, নৌনির্মাণ ও সামুদ্রিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করে। সন্দ্বীপের এই সমৃদ্ধ অতীত একে ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 77
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 693 - 700
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সন্দ্বীপ নামকরণ সম্পর্কেও বিভিন্ন মত প্রচলিত রয়েছে, যা দ্বীপটির ইতিহাস, ভূগোল ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। একটি জনপ্রিয় মত অনুসারে, বারো আউলিয়া চট্টগ্রাম অভিমুখে যাত্রাকালে দ্বীপটিকে জনমানবশূন্য অবস্থায় দেখতে পেয়ে 'শূন্যদ্বীপ' নামে অভিহিত করেছিলেন; পরবর্তীকালে শব্দগত পরিবর্তনের মাধ্যমে 'শূন্যদ্বীপ' থেকেই 'সন্দ্বীপ' নামের উৎপত্তি ঘটে। ইতিহাসবিদ বেভারিজের মতে, 'সন্দ্বীপ' নামটির উৎস চন্দ্রদেবতা 'সোম'-এর নাম থেকে উদ্ভূত। তাঁর ধারণা অনুযায়ী, দ্বীপটির প্রাচীন নাম ছিল 'সোমদ্বীপ', যা ধ্বনিগত পরিবর্তনের মাধ্যমে 'সন্দ্বীপ' রূপ ধারণ করে।[৩] আবার অনেকের মতে, দ্বীপটির প্রাকৃতিক উর্বরতা ও ঐশ্বর্যের কারণে এটি 'স্বর্ণদ্বীপ' নামে পরিচিত ছিল এবং পরবর্তীকালে সেই নাম থেকেই 'সন্দ্বীপ' শব্দের উৎপত্তি ঘটে। অন্য একটি মত অনুযায়ী, ইউরোপীয় বণিক ও উপনিবেশবাদীরা সমুদ্রপথে বাংলায় আগমনের সময় দূর থেকে দ্বীপটিকে বালির স্তূপ (Sand Heap) বলে মনে করত এবং সেই সূত্রেই 'Sand-Heap' শব্দটির রূপান্তর ঘটতে ঘটতে 'সন্দ্বীপ' নামের উদ্ভব হয়। সন্দ্বীপ নামকরণ সম্পর্কিত এই বহুমাত্রিক মতামত দ্বীপটির দীর্ঘ ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের দিকেই ইঙ্গিত করে। ধর্মীয় কিংবদন্তি, ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা এবং ঔপনিবেশিক পর্যবেক্ষণ— সবমিলিয়ে সন্দ্বীপের নামকরণ ইতিহাস একটি সমৃদ্ধ ও জটিল ঐতিহাসিক ধারার পরিচয় বহন করে।

১৫৭৪ সালে মুঘলরা পূর্ববঙ্গ জয় করে এবং ১৫৮২ সালে সুবেদার টোডরমল সন্দ্বীপকে ফতেহাবাদ সরকারের অন্তর্ভুক্ত করেন। পরবর্তীকালে বারোভূঁইয়ার অন্যতম সেনানায়ক কেদার রায় ১৬০২ সালে কার্ভালোর নেতৃত্বে সন্দ্বীপ দখল করেন। তবে অল্প সময়ের মধ্যেই পর্তুগিজ সেনানায়ক ইমানুয়েল ডি মেট্রসের সহায়তায় দ্বীপটি পুনরুদ্ধার করা হয়। পর্তুগিজদের এই আধিপত্য ক্রমে আরাকান রাজ্যের সঙ্গে সংঘর্ষে রূপ নেয়। কয়েক দফা যুদ্ধে তারা জয়লাভ করলেও দীর্ঘমেয়াদে শাসন বজায় রাখতে সক্ষম হয়নি। ১৬১০ সালে পর্তুগিজ জলদস্যু গঞ্জালিস, রামচন্দ্র রায়ের সহযোগিতায় সন্দ্বীপ দখল করেন; কিন্তু ১৬১৬ সালে আরাকান রাজ তাঁকে পরাজিত করে সেই শাসনের অবসান ঘটান। দীর্ঘদিনের জলদস্যুতা ও রাজনৈতিক অস্থিরতার ফলে সন্দ্বীপ প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়ে।

এই পরিস্থিতিতে ১৬১৮ সালে সুবেদার ইব্রাহিম খাঁর আমলে দেলওয়ার খাঁ সন্দ্বীপে বসতি স্থাপন করে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। প্রথমদিকে তিনি আরাকান রাজ্যের অধীনতা স্বীকার করলেও পরবর্তীকালে স্বাধীন শাসক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন এবং ধীরে ধীরে নিজের ক্ষমতার পরিসর বিস্তৃত করেন। তাঁর দক্ষ সামরিক নেতৃত্বে আরাকানী নৌবাহিনী 'মগধরা' যুদ্ধে পরাজিত হয়। দেলওয়ার খাঁর এই উত্থান মুঘল প্রশাসনের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ফলে ১৬৬৪ সালে সুবেদার শায়েস্তা খাঁ তাঁকে মুঘল শাসনের অধীনস্থ করার চেষ্টা চালান। প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে ১৬৬৫ সালে দু'দফা সামরিক অভিযান পরিচালিত হয়। প্রথম আক্রমণে দেলওয়ার খাঁ সফলভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুললেও দ্বিতীয় আক্রমণে তিনি পরাজিত ও বন্দি হন। পরবর্তীকালে তাঁকে ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে ৮৩ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু ঘটে। এই ঘটনাই দেলওয়ার খাঁ বা দিলালের জীবনের শেষ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত।[৪] এর মধ্য দিয়ে সন্দ্বীপে তাঁর স্বাধীন শাসনেরও অবসান ঘটে।

দেলওয়ার খাঁর মৃত্যুর পর বাংলার মুঘল রাজস্ব প্রশাসন সন্দ্বীপে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে ইজারা বন্দোবস্ত প্রবর্তন করে। মুঘল রাজস্ব সচিব বা আহাদদার স্থানীয় ইজারাদারদের মাধ্যমে কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতেন। ধারণা করা হয়, আনুমানিক ১৬৭০ থেকে ১৬৯০ সালের মধ্যে দেলওয়ার খাঁর জামাতা চাঁদ খাঁ সন্দ্বীপ পরগনার অর্ধেকেরও বেশি ভূমির ইজারা লাভ করেন। পরবর্তীকালে ১৬৯০ থেকে ১৭৩০ সালের মধ্যে চাঁদ খাঁর দুই পুত্র—জুনুদ খাঁ ও মুকিম খাঁ এবং অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যক্তি, যেমন মোহাম্মদ হানিফের পুত্র মোহাম্মদ মুকিম ও মধুসূদনের পুত্র জনার্দন, সন্দ্বীপের জমিদার শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হন। এদের মধ্যে জুনুদ খাঁ ও মুকিম খাঁ বৃহত্তর অংশের জমিদারির মালিক হওয়ায় প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব মূলত তাঁদের হাতেই কেন্দ্রীভূত ছিল।

আনুমানিক ১৭৩০ থেকে ১৭৫০ সালের মধ্যে জমিদার শ্রেণির নেতৃত্বে নতুন প্রজন্মের উত্থান ঘটে। এ সময় জুনুদ খাঁর পুত্র মোহাম্মদ রাজা, মুকিম খাঁর পুত্র মোহাম্মদ হোসেন, মোহাম্মদ মুকিমের পুত্র বাখর মোহাম্মদ ও জাফর

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 77
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 693 - 700
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

মোহাম্মদ, এবং জনার্দনের পুত্র রামচন্দ্র জমিদার শ্রেণির নেতৃত্বে আসেন।[৫] বাখর মোহাম্মদের নামানুসারে তাঁর জমিদারি 'বাখরপুর জমিদারি' নামে পরিচিতি লাভ করে। ১৭৪৩ সালে জমিদার মোহাম্মদ হোসেন মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পুত্র আবু তোরাপ জমিদারির উত্তরাধিকারী হন। একই সময়ে আবু তোরাপের পাশাপাশি মোহাম্মদ মুরাদ, মোহাম্মদ ইব্রাহিম, মোহাম্মদ ওয়াছিম, মোহাম্মদ আকবর ও সূর্য নারায়ণ প্রমুখ সন্দ্বীপের বিভিন্ন জমিদারির অধিকার লাভ করেন। এদের মধ্যে আবু তোরাপ ছিলেন সর্বাধিক প্রভাবশালী ও ক্ষমতাশালী জমিদার। আনুমানিক ১৭৫০ থেকে ১৭৬৩ সাল পর্যন্ত তিনি অত্যন্ত প্রতাপের সঙ্গে সন্দ্বীপে জমিদারি পরিচালনা করেন। তাঁর নেতৃত্বেই সন্দ্বীপে দ্বিতীয় বৃহৎ বিদ্রোহ সংঘটিত হয়, যা ছিল ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সন্দ্বীপের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধ আন্দোলন।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধি এবং বাংলা ও বিহারের গভর্নর ভেরেলেস্ট নবাব মীর কাসেমের আদেশে ১৭৬১ সালে চট্টগ্রামের শাসনক্ষমতা গ্রহণ করেন। ভেরেলেস্টের সদর দপ্তরের কেরানি ও বেনিয়ান ছিলেন খিদিরপুরের ঘোষাল বংশের গোকুল ঘোষাল। মুঘল প্রশাসনিক রীতিনীতি উপেক্ষা করে এবং শেষ ওয়াদাদার ওজাকুর মলকে অগ্রাহ্য করে ভেরেলেস্ট ১৭৬৩ সালে গোকুল ঘোষালকে বেনামিভাবে সন্দ্বীপের আহাদদার নিযুক্ত করেন। এই আহাদদারি লাভের পেছনে একটি সুপরিকল্পিত কৌশল কার্যকর ছিল। গোকুল ঘোষাল তাঁর বিশ্বস্ত কর্মচারী বিষ্ণুচরণ বসুর নামে একটি কোম্পানি নিবন্ধন করেন এবং সেই কোম্পানির মাধ্যমেই সন্দ্বীপের আহাদদারি গ্রহণ করা হয়। কার্যত বিষ্ণুচরণকে আড়ালে রেখে গোকুল ঘোষাল নিজেই আহাদদারের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে থাকেন এবং সেই ক্ষমতার বলে সন্দ্বীপের কৃষকদের ওপর ব্যাপক অত্যাচার ও শোষণ চালান। গোকুল ঘোষালের পেছনে ছিল ইংরেজ বণিকশক্তির সামরিক ও প্রশাসনিক সমর্থন। আহাদদার হিসেবে তাঁর হাতে রাজস্ব আদায়ের পাশাপাশি বিচারিক ক্ষমতাও ন্যস্ত ছিল। ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি সন্দ্বীপের একচ্ছত্র ক্ষমতাধর শাসকে পরিণত হন।[৬] ১৭৬৩–৬৪ সালে তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পক্ষে রাজস্ব সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সন্দ্বীপে আগমন করেন। স্বভাবতই তখনকার প্রতাপশালী জমিদার আবু তোরাপ চৌধুরী গোকুল ঘোষালের মতো ক্ষমতালোভী ও বহিরাগত ব্যক্তির কর্তৃত্ব মেনে নিতে রাজি হননি। ক্রমে গোকুল ঘোষালের সঙ্গে আবু তোরাপের বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করে।

১৭৬৭ সালে আবু তোরাপ ইংরেজ ওয়াদাদারদের কাছে রাজস্ব প্রদান সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেন। একই সঙ্গে গোকুল ঘোষালের প্রতিনিধিদের সন্দ্বীপ থেকে বিতাড়নের জন্য তিনি তাঁর সেনাপতি মালকামকে নির্দেশ দেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে নবাব মীর কাসেমের নির্দেশে চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী থেকে নবাব-অনুগত সৈন্যদল আবু তোরাপের বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়। কিন্তু আবু তোরাপের প্রতিরোধ ও স্থানীয় জনগণের সমর্থনের মুখে ওয়াদাদারের অনুগত বাহিনী কিছুদিনের মধ্যেই সন্দ্বীপ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। পরবর্তীকালে ক্যাপ্টেন নলকিন্সসহ কয়েকজন সেনানায়কের নেতৃত্বে ইংরেজ সেনাবাহিনী নদীপথ অতিক্রম করে সন্দ্বীপে প্রবেশ করে। ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে আবু তোরাপ ও ক্যাপ্টেন নলকিন্সের বাহিনীর মধ্যে এক তীব্র ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে আবু তোরাপ শহীদ হন। সন্দ্বীপের 'চারি আনি হাট'-এর পূর্বদিকে অবস্থিত 'কিল্লা বাড়ি'-র ভগ্নাবশেষ আজও সেই যুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন বহন করে চলেছে।[৭]

আবু তোরাপের পতনের পর সন্দ্বীপের অন্যান্য জমিদার ইংরেজ শাসনের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য হন। এর ফলে তাঁদের জমিদারি সাময়িকভাবে ফিরিয়ে দেওয়া হলেও প্রকৃত ক্ষমতা ক্রমশ গোকুল ঘোষালের হাতেই কেন্দ্রীভূত হতে থাকে। এদিকে আবু তোরাপের জমিদারি গোকুল ঘোষাল ভবানীচরণ দাসের নামে বন্দোবস্ত করে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখেন। ফলে তিনি ধীরে ধীরে সন্দ্বীপের সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। জমিদারদের জমিদারি ফিরিয়ে দেওয়ার আনুষ্ঠানিকতা থাকলেও অল্প সময়ের মধ্যেই গোকুল ঘোষাল নানা কৌশলে সেগুলো পুনরায় নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেন। এরপর তিনি সন্দ্বীপের সাধারণ অধিবাসী ও কৃষকদের ওপর অত্যাচার, শোষণ ও উৎপীড়নের মাত্রা আরও বৃদ্ধি করেন।

গোকুল ঘোষালের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষকেরা ইংরেজ প্রশাসনের কাছে একাধিকবার অভিযোগ ও আবেদন জানায়। কিন্তু কোম্পানি শাসকগোষ্ঠী সেই অভিযোগের প্রতি কোনো গুরুত্ব দেয়নি। সকল প্রকার আবেদন-নিবেদন ব্যর্থ হলে সন্দ্বীপের কৃষকেরা ক্রমশ সশস্ত্র প্রতিরোধের পথে অগ্রসর হতে শুরু করে। প্রথমদিকে তারা খাজনা প্রদান বন্ধ করে অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। অপরদিকে গোকুল ঘোষালও কঠোর দমননীতির আশ্রয় নেন। জোরপূর্বক খাজনা আদায়ের

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 77
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 693 - 700
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

জন্য তিনি গ্রামে গ্রামে পেয়াদা ও পুলিশ পাঠাতে থাকেন। এসব কর্মচারী বলপ্রয়োগের মাধ্যমে খাজনা আদায় করত; অন্যথায় প্রজাদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করা হত। ফলে কৃষকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও অসন্তোষ দানা বাঁধে। ক্রমে কৃষকেরা সম্মিলিতভাবে এই নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। অবশেষে ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দের শেষদিকে ইংরেজ বাহিনীর একটি সৈন্যদল সন্দ্বীপে এসে ব্যাপক দমন-পীড়ন চালায় এবং বহু কৃষককে হত্যা করে বিদ্রোহ দমন করে। উন্নত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ইংরেজ সেনাবাহিনীর মুখে কৃষকেরা সাময়িকভাবে পরাজিত হলেও তাদের প্রতিরোধ চেতনা বিনষ্ট হয়নি; বরং ভবিষ্যতে আরও বৃহত্তর ও দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের মানসিক প্রস্তুতি গড়ে ওঠে।[৮] এই পরিস্থিতিতে ১৭৭২–৭৩ সালের দিকে সন্দ্বীপে ওয়াদাদার পদ বিলুপ্ত করে একজন আমিন (ম্যাজিস্ট্রেট) নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কিন্তু প্রশাসনিক এই পরিবর্তন সত্ত্বেও কার্যত গোকুল ঘোষালই সন্দ্বীপের প্রকৃত নিয়ন্ত্রক হিসেবে বহাল থাকেন। শেষপর্যন্ত স্থানীয় জমিদাররা বাধ্য হয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিকট গোকুল ঘোষালের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করেন। এরই প্রেক্ষিতে ঢাকার প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ ১৭৭৮ সালে ডানকান নামক এক ইংরেজ কর্মকর্তাকে প্রকৃত পরিস্থিতি তদন্তের উদ্দেশ্যে সন্দ্বীপে প্রেরণ করে।[৯] ডানকানের হস্তক্ষেপের ফলে ১৭৮৩ সালে কোরেশা বানুসহ আরও দুই জমিদার তাঁদের জমিদারি পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন। তবে আবু তোরাপ চৌধুরীর জমিদারি তাঁর পুত্র আলী রাজাকে ফিরিয়ে না দিয়ে ভবানীচরণ দাসের নামে গোকুল ঘোষালের নিয়ন্ত্রণেই রাখা হয়। এ অবস্থায় গোকুল ঘোষাল ও ভবানীচরণ দাসের মতো ইংরেজপুষ্ট জমিদারদের বিরুদ্ধে স্থানীয় জোতদার, তালুকদার ও কৃষকদের অসন্তোষ ক্রমশ তীব্র আকার ধারণ করে।

গোকুল ঘোষাল স্বনামে ও বেনামে জমিদারি ক্রয়, দুর্নীতি, লুণ্ঠন, দীর্ঘমেয়াদি আহাদদারি এবং লবণের ইজারা থেকে বিপুল সম্পদের মালিক হয়ে ওঠেন। সন্দ্বীপ থেকে সংগৃহীত ও লুণ্ঠিত এই সম্পদের ভিত্তিতেই কলকাতার খিদিরপুরে ভুর্কেলাস রাজপ্রাসাদকেন্দ্রিক ঘোষাল রাজবংশের উত্থান ঘটে। সন্দ্বীপের মানুষের স্মৃতিতে তিনি আজও এক শোষক ও অত্যাচারী শাসক হিসেবেই চিহ্নিত। তাঁর প্রবর্তিত ছলনা, বলপ্রয়োগ ও কৌশলনির্ভর শোষণব্যবস্থা পরবর্তী জমিদাররাও অনুসরণ করতে থাকে। অন্যদিকে সন্দ্বীপ ও হাতিয়ায় প্রবল নদীভাঙন শুরু হলে কৃষকেরা নির্ধারিত হারে খাজনা দিতে ব্যর্থ হয়। ফলে একদিকে প্রজারা খাজনা প্রদান বন্ধ করে দেয়, অন্যদিকে জমিদাররাও সরকারের নির্ধারিত রাজস্ব পরিশোধে অক্ষম হয়ে পড়ে। এই আর্থিক সংকটের ফলস্বরূপ ১৭৯৭ থেকে ১৮১৮ সালের মধ্যে কোরেশা বানু, রামচন্দ্র রায় ও রাজদুর্লভ রায়ের জমিদারির অংশবিশেষ নিলামে বিক্রি হয়ে যায়। এ সময় সন্দ্বীপের প্রায় অর্ধেক জমিদারি প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের নামে বন্দোবস্ত করা হয়। প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের পিতা রামচন্দ্র বিশ্বাস ছিলেন চট্টগ্রামের সরকারি নিমক মহলের দেওয়ান। নতুন জমিদার প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস ইংরেজ প্রশাসনের প্রত্যক্ষ সমর্থনে নিলামে ক্রয়কৃত জমিদারি থেকে কঠোরভাবে খাজনা আদায় শুরু করলে সন্দ্বীপের কৃষকদের মধ্যে পুনরায় বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। ক্রমবর্ধমান শোষণ ও দমননীতির বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ কৃষকেরা ১৮১৯ সালে ইংরেজদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয়বারের মতো বৃহৎ কৃষক বিদ্রোহে অবতীর্ণ হয়। প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস ছিলেন সন্দ্বীপের বাইরের ব্যক্তি, অর্থাৎ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর দৃষ্টিতে একজন বহিরাগত জমিদার। অন্যদিকে, যেসব জমিদারের জমিদারি নিলামে বিক্রি হয়ে গিয়েছিল, তারা সকলেই ছিলেন সন্দ্বীপের স্থানীয় অধিবাসী। ফলে সম্পত্তিহারা স্থানীয় জোতদারগণ বিদ্রোহী প্রজাদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। কৃষকেরাও মূলত কোম্পানি-সমর্থিত জমিদার প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের শোষণ ও অত্যাচার থেকে মুক্তির লক্ষ্যে স্থানীয় জোতদারদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। এর ফলে সম্পত্তিহারা জোতদার ও শোষিত কৃষকদের যৌথ সংগ্রাম বিদ্রোহকে আরও সুসংগঠিত ও শক্তিশালী করে তোলে।

এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন গোবিন্দচরণ চৌধুরী নামের এক সাহসী ও দৃঢ়চেতা কৃষক নেতা। ১৮১৯ সালে তাঁর নেতৃত্বে সশস্ত্র কৃষক বাহিনী এবং জমিদার প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের পাইক-বরকন্দাজদের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ সংঘটিত হয়। এই সংঘর্ষে প্রাণকৃষ্ণের বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় এবং গোবিন্দচরণ ‘সন্দ্বীপের বীর’ উপাধিতে ভূষিত হন।[১০] এভাবেই সন্দ্বীপের দ্বিতীয় কৃষক বিদ্রোহে কৃষকরা এক গুরুত্বপূর্ণ বিজয় অর্জন করে। রাজস্ব আদায়ে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হওয়ার ফলে প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের জমিদারি ১৮২৪ সালের ১ জুলাই প্রকাশ্য নিলামে তোলা হয়। কিন্তু কোনো ক্রেতা না পাওয়ায় ব্রিটিশ

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 77
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 693 - 700
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সরকার মাত্র এক টাকায় সন্দ্বীপের জমিদারি অধিগ্রহণ করে।[১১] এর মধ্য দিয়ে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সংঘটিত 'সন্দ্বীপের দ্বিতীয় কৃষক বিদ্রোহ'-এ সন্দ্বীপবাসী এক ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জন করে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুযায়ী নির্ধারিত দিনের সূর্যাস্তের পূর্বে কোনো জমিদার রাজস্ব পরিশোধে ব্যর্থ হলে তার জমিদারি বাজেয়াপ্ত করার বিধান ছিল। এই আইনের আওতায় ১৮২৪ ও ১৮২৫ সালে ফুলবিবি ও আলী রাজার জমিদারি নিলামের মাধ্যমে সরকারের অধিকারে চলে যায়।[১২] পরবর্তীকালে ১৮২৯ সালে প্রাথমিকভাবে এবং ১৮৭৯ সালে চূড়ান্তভাবে ভবানীচরণের জমিদারিও রাজস্ব অনাদায়ের কারণে নিলামে বিক্রি হয়ে যায়। কয়েক বছর সরকারি তত্ত্বাবধানে রাখার পর ১৮৪৫ সালে সন্দ্বীপের প্রায় চার ভাগের তিনভাগ জমিদারি কালাপানিয়ার সরাফত আলী চৌধুরীর নিকট ইজারা বন্দোবস্তে প্রদান করা হয়। পরবর্তীকালে মিঃ জোয়াকিন্স এবং মিঃ এডওয়ার্ড পেকসোয়ালও এই ইজারা লাভ করেন। ১৮৬৯ সালে ইজারা ব্যবস্থার অবসান ঘটে। তবে ইজারা ব্যবস্থা প্রত্যাশিত সুফল বয়ে আনতে ব্যর্থ হওয়ায় সরকার সন্দ্বীপের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ জমিদারি পুনরায় নিলামে বিক্রি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৮৭০ সালে অ্যাচিলা কোর্জন নিলামের মাধ্যমে সন্দ্বীপের জমিদারি ক্রয় করেন। জমিদারি লাভের পরপরই তিনি কঠোরভাবে রাজস্ব আদায় ও প্রজা শাসনের নীতি গ্রহণ করেন। প্রজাদের মতামত উপেক্ষা করে ভূমি জরিপ পরিচালনা, জোরপূর্বক কবুলিয়ত সম্পাদন এবং জমির খাজনা বৃদ্ধি কার্যকর করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এমনকি প্রয়োজনবোধে প্রজাদের বাড়িঘর ধ্বংস করেও রাজস্ব আদায় করা হবে— এমন মনোভাব তাঁর প্রশাসনিক আচরণে প্রতিফলিত হয়। রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে অ্যাচিলা কোর্জন আমিন, আমলা, ঘোড়া ও গোলাবারুদসহ সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে সন্দ্বীপে প্রবেশ করলে স্থানীয় জনগণের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। কিন্তু ভীত বা নিরুৎসাহিত না হয়ে মুন্সি চাঁদ মিয়ার নেতৃত্বে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে কৃষকেরা সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলে। চাঁদ মিয়া সরাসরি সশস্ত্র সংঘর্ষের পথ পরিহার করে অসহযোগ আন্দোলনের কৌশল গ্রহণ করেন এবং কৃষকদের উদ্দেশ্যে কয়েকটি নির্দেশ জারি করেন—

১. জমিদারের কোনো কর্মচারীকে আশ্রয় দেওয়া যাবে না।
২. জমিদার বা তাঁর কর্মচারীদের কাছে কোনো খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করা যাবে না।
৩. আমিনদের জরিপকার্যে কোনো প্রকার সহায়তা করা যাবে না।
৪. কোনো প্রজা উপরোক্ত নির্দেশ অমান্য করলে তার বাড়িতে 'লাল বলদ' পাঠানো হবে, যার অর্থ ছিল ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া।

কৃষকদের কর্তব্য ও সংগ্রামের কৌশল স্থানীয় ভাষায় রচিত ছড়ার মাধ্যমে গানরূপে প্রচারিত হয় এবং বিদ্রোহ চলাকালে সেই গান সন্দ্বীপের সর্বত্র ধ্বনিত হতে থাকে। এই সাংগঠনিক ঐক্য ও সামাজিক প্রতিরোধ আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করে তোলে। শেষ পর্যন্ত জমিদার অ্যাচিলা কোর্জন খাজনা আদায় বা অন্য কোনো প্রশাসনিক লক্ষ্য বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়ে সশস্ত্র বাহিনীসহ সন্দ্বীপ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। ফলে কোনো বৃহৎ রক্তপাত ছাড়াই কেবলমাত্র কৃষকদের সংঘবদ্ধতা, দৃঢ়তা ও অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে ইংরেজপুষ্ট জমিদারি শাসনের বিরুদ্ধে সন্দ্বীপের কৃষকেরা এক ঐতিহাসিক বিজয় অর্জন করে।[১৩]

আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অধীনে সন্দ্বীপে সংঘটিত কৃষক বিদ্রোহসমূহের পেছনে বহুমাত্রিক অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণ ক্রিয়াশীল ছিল। বিশেষত ব্রিটিশ শাসনামলে সংঘটিত তিনটি বৃহৎ কৃষক বিদ্রোহের প্রকৃতি, চরিত্র ও কারণ সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে। সন্দ্বীপের কৃষক বিদ্রোহ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে জোতদার–জমিদার সম্পর্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। কৃষিভিত্তিক উৎপাদনব্যবস্থা এবং গ্রামীণ সমাজের স্তরবিন্যাসের প্রেক্ষাপটে রজত কান্ত রায় ও রত্নলেখা রায়ের প্রস্তাবিত 'জোতদার তত্ত্ব' এখানে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। এই তত্ত্ব অনুসারে বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে ও পরবর্তী সময়ে জমিদাররা মূলত রাজস্ব আদায়কারী শ্রেণি হিসেবে কার্যকর ছিল; কৃষি উৎপাদনের প্রত্যক্ষ সংগঠক হিসেবে তাদের ভূমিকা ছিল সীমিত। অন্যদিকে জমিদারদের নিচে অবস্থানকারী জোতদাররাই গ্রামীণ অর্থনীতির কার্যকর নিয়ন্ত্রক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 77
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 693 - 700
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অষ্টাদশ শতক থেকেই বাংলার গ্রামীণ সমাজে জোতদারদের শক্তিশালী উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। বাস্তবে তারাই ছিল গ্রামের প্রভাবশালী ভূমিমালিক গোষ্ঠী, যারা জমির ওপর কার্যকর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং দরিদ্র কৃষকদের শ্রমশক্তিকে নিজেদের স্বার্থে নিয়ন্ত্রণ করত। ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পর ভূমিরাজস্ব আদায়ের চাপ ক্রমশ বৃদ্ধি পেলে জমিদারদের শোষণ আরও তীব্র আকার ধারণ করে। এই পরিস্থিতিতে জোতদাররাই কৃষকদের সংগঠিত করে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে শুরু করে।[১৪] সন্দ্বীপের বিদ্রোহসমূহে আবু তোরাপ, গোবিন্দচরণ চৌধুরী ও চাঁদ মিয়া— এই তিনজনই ছিলেন স্থানীয় জোতদার, যারা ইংরেজপুষ্ট জমিদার ও ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে কৃষকদের নেতৃত্ব প্রদান করেছিলেন। প্রথম পর্যায়ে কৃষকদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক চেতনা সুস্পষ্টভাবে বিকশিত হয়নি; তারা মূলত জোতদারদের নেতৃত্ব ও প্রভাবের অধীন থেকেই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল। জোতদাররাও নিজেদের সামাজিক ক্ষমতা ও প্রভাব সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে কৃষকদের সংগঠিত করেছিল। তবে বহিরাগত ইংরেজ-সমর্থিত জমিদারদের তুলনায় স্থানীয় জোতদারদের প্রতি কৃষকদের আস্থা ও নির্ভরতা ছিল অনেক বেশি। ব্রিটিশদের প্রবর্তিত নতুন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় জমিদাররা নিজেদের জমিদারি রক্ষার স্বার্থে কৃষকদের ওপর অতিরিক্ত খাজনার বোঝা চাপিয়ে দেয়, ফলে কৃষকদের মধ্যে তাদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ক্রমশ তীব্র হয়ে ওঠে।

১৭৬৯ সালের বিদ্রোহে কৃষকদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক চেতনা কতটা বিকশিত হয়েছিল, তা নিয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে সংশয় রয়েছে। তবে ১৮১৯ সালের বিদ্রোহে সেই চেতনার সুস্পষ্ট প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। গোবিন্দচরণ চৌধুরীর নেতৃত্বে সংঘটিত সশস্ত্র প্রতিরোধে কৃষকদের সক্রিয় ও সংঘবদ্ধ অংশগ্রহণই এর প্রমাণ বহন করে। পরবর্তীকালে ১৮৭০ সালের বিদ্রোহে মুন্সি চাঁদ মিয়ার নেতৃত্বে কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ সংগঠন, সভা-সমিতি গঠন এবং অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে কৃষক চেতনার আরও পরিণত ও সুসংগঠিত রূপ প্রতিফলিত হয়।

গোকুল ঘোষাল, প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস ও অ্যাচিলা কোর্জনের মতো বহিরাগত আহাদদার ও জমিদাররা ইংরেজ শাসনের প্রত্যক্ষ সমর্থনে সন্দ্বীপে নতুন ভূমিরাজস্ব ও জরিপ নীতি কার্যকর করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এই নীতিসমূহ স্থানীয় কৃষকদের স্বার্থের পরিপন্থী হওয়ায় প্রবল প্রতিরোধের সৃষ্টি হয়। অপরদিকে আবু তোরাপ, গোবিন্দচরণ চৌধুরী ও চাঁদ মিয়া কৃষকদের ক্ষোভ, অসন্তোষ ও বিক্ষোভকে সংঘবদ্ধ বিদ্রোহে রূপ দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ফলে জোতদারদের নেতৃত্ব এবং কৃষকদের বিদ্রোহী মানসিকতার সমন্বয়ে সন্দ্বীপের কৃষক আন্দোলন একটি শক্তিশালী সামাজিক প্রতিরোধে পরিণত হয়।

এই ধারাবাহিক সংগ্রামের ফলস্বরূপ আহাদদার পদ বিলোপ, স্থানীয় জোতদারদের জমি পুনরুদ্ধার এবং ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের মতো গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছিল। যদিও ১৭৬৯ থেকে ১৮৭০ সাল পর্যন্ত প্রায় এক শতাব্দীব্যাপী এই সংগ্রাম কৃষকদের জন্য মোটেও সহজ ছিল না, তথাপি তাদের দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধ বাংলার অন্যান্য কৃষক আন্দোলনের জন্যও অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে ওঠে। সন্দ্বীপের কৃষক বিদ্রোহ তাই কেবল একটি আঞ্চলিক বিদ্রোহ নয়; বরং এটি বাংলার কৃষক সমাজের রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ, সামাজিক প্রতিরোধ এবং ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিল।

Reference:

১. চক্রবর্তী, রাজকুমার এবং দাস, অনঙ্গমোহন, *সন্দ্বীপের ইতিহাস,* পুনমুদ্রণ, কলকাতা : একুশে, আগস্ট ২০১৬, পৃ. ৫৮
২. ঐ, পৃ. ৫৯
৩. সেন, প্যারীমোহন, *নোয়াখালীর ইতিহাস,* দ্বিতীয় প্রকাশ, ঢাকা : বইপত্র বাংলাবাজার, মার্চ ২০২০, পৃ. ৯৯
৪. ঐ, পৃ. ৭৯
৫. চক্রবর্তী, রাজকুমার এবং দাস, অনঙ্গমোহন, *তদেব,* পৃ. ৯৫–১০৩
৬. রায়, সুপ্রকাশ, *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম,* নবম সংস্করণ, কলকাতা : বুক ওয়ার্ল্ড, মার্চ ২০০৮, পৃ. ৫৩

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 77
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 693 - 700
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৭. চক্রবর্তী, রাজকুমার এবং দাস, অনঙ্গমোহন, *তদেব*, পৃ. ৯৯
৮. বিশ্বাস, দীপঙ্কর, 'সন্দ্বীপের বিদ্রোহ : কৃষক বিদ্রোহের এক অনন্য নজির', নাথ, রাখালচন্দ্র (সম্পা.), *আঠারো ও উনিশ শতকের বাংলার কৃষক অসন্তোষ ও বিদ্রোহের ইতিবৃত্ত*, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা : প্রগতিশীল, মে ২০১৮, পৃ. ৭৬
৯. চক্রবর্তী, রাজকুমার এবং দাস, অনঙ্গমোহন, *তদেব*, পৃ. ১০১
১০. ঐ, পৃ. ১০৯
১১. বিশ্বাস, দীপঙ্কর, *তদেব*, পৃ. ৭৮
১২. চক্রবর্তী, রাজকুমার এবং দাস, অনঙ্গমোহন, *তদেব*, পৃ. ১০৯
১৩. রায়, সুপ্রকাশ, *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*, পৃ. ৩৪৩ – ৩৪৪
১৪. সরকার, সুমিত, *মডার্ন টাইমস : ভারত ১৮৮০ দশক থেকে ১৯৫০-এর দশক*, ভাষান্তর : আশীষ লাহিড়ী, প্রথম অনুবাদ সংস্করণ, কলকাতা : কেপি বাগচি এন্ড কোম্পানি, ২০১৯, পৃ. ১২৮